এই লেখকের ঃ

রোদ জল ঝড় পরম্পরা কালোমেঘ বন হরিণীর সংসার
একটি পৃথিবী একটি হৃদয় আলোয় আলোয় অনেক সুর
লাইলাক একটি ফুল সুভদ্রার ভিটে জীবন যৌবন
মন দেউলে দীপালোক মধুরেন স্বপ্ন কোরক
শতাব্দীর সূর্য ছেড়ে আসা গ্রাম বিদেশ-বিভুঁই
সংস্কৃতির ধর্ম (যন্ত্রস্থ)
আরো সূর্যের কাছে
বীর বাহাদুর পেনাঙ্ এর পাহাড়ে সাগররাণীর দেশে
এবং অন্যান্য

সংজনী

৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড॥ কলিঃ-৩৭

প্রথম প্রকাশ
২৬ ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক
সত্য চৌধুরী
স্বজনী
৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা—৩৭

মুদ্রাকর
মৃগেন্দ্রনাথ মাজী
সৃজনী প্রেস
৬৭এ, বেলগাছিয়া রোড
কলিকাতা—৩৭

প্রচ্ছদ ঃ মলয়শঙ্কর দাশগুপ্ত

স্বজনী'র
কলেজ স্ট্রীট বিক্রয়কেন্দ্র ঃ

দে বুক স্টোরস
১৩/১, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা—১২

কবিবন্ধু

অধ্যাপক শ্রীজগদীশ ভট্টাচার্যের

করকমলে

অনেক
বেলা

জীবনায়ন

পায়ে পায়ে চলে পথ
অনেক অচেনা মাটি হলো পরিচিত,
অনেক অজানা মুখ সলজ্জ রাত্রির বুকে
জ্বলে যেন মিটি মিটি প্রদীপের মতো।
কত যে অস্থির দিন হয়েছে বিগত—
কোথায় হিসেব পাই ?
কীই বা তার প্রয়োজন ?
জানা আছে অঙ্ক কষে কোনো লাভ নাই
তবুও অভ্যাস দোষে
মাঝে মাঝে পিছু হাতড়াই।

শুধু মাত্র মৃত্যু ভয় নয় ;
দুঃখ-শোক, অভিমান
লজ্জা, অসম্মান,
সুখ-স্মৃতি, আশা ও আশ্বাস—
সবই জানি জীবনেরে করে পরিহাস।
অকারণ ঘিরে থাকে
ওরা যেন ছায়ার মতন।
ওদের কবল থেকে
মুক্তি আমি চাই !
হয়তো বা তাই,
আমার মানসকুঞ্জে
বেজে উঠে সহসা সানাই।
চিরন্তন সত্য শুধু জীবন পূজাই।

৩.১০.৫২

পঞ্চশীলা

কাটাকাটি করে সব শেষে জমে
শুধুই শূন্য ফল ,
শূন্যবাদের মহিমা অতুল,
পরম মোক্ষে নাই কোনো ভুল ;
বিশ্ব জুড়িয়া পুণ্যবানেরা
পাতিয়াছে সেই কল !

অদত্ত যাহা নিতে নাই নাকি—
ঘুষ অদত্ত নয় !
চারিদিকে শুধু পাতা থাকে জাল,
অলক্ষ্যে জমে মোহরের টাল,
নির্মোহ হয়ে মোহময় ব্যাংক
তাহাই কুড়ায়ে লয় ।

বসুন্ধরা তো বীরের ভোগ্যা—
খাসা এই সার কথা ।
খাস পৃথিবীর নেই যদি দোষ,
অপরের বেলা অকারণ রোষ ;
পণ্যা তো তাই কন্যারা যত ।
ব্যাভিচার বলা বৃথা ।

বহু পুণ্যে এ মানব জন্ম
অমৃতের সন্তান

লক্ষ্য সাধনে যাহা প্রয়োজন
যাই বলো তাই সত্য কথন
মিছে নেই কিছু জগৎ সত্য,
মানুষ সত্যবান।

প্রাণ আছে তাই পানের পিপাসা
সৃষ্টির সেরা দান।
দুঃখ নিরোধে চরম পন্থা,
আত্মপর বোধে পরম হন্তা ;
পান-প্রমত্ত অহরহ লাভ
মহাপরিনির্বাণ।

৬.২.৫৩

আক্রোশিয়া ছাড়ো

আমাদের ভালো আর ভেবো না
অকারণ মাথাব্যথা অশোভন
এশিয়ার আশেপাশে এসো না
মনের কথাটি আজ অগোপন।

দুনিয়ার দুখে আর কেঁদো না
দোহাই, দু'পায়ে পড়ি দূরে যাও
সুখের ছলনা নিয়ে হেসো না
সহানুভূতির ভূত ফিরে নাও।

ওধারের লোক কেন এধারে ?
বেশ জানি ভালো কিসে আমাদের।
সুড় সুড় সরে পড়ো আঁধারে,
প্রয়োজন নেই কোনো তোমাদের।

আমাদের ঘর-বাড়ী আমরাই
গোছগাছ করে নেবো যে যেমন ;
ভাববার নেই কোনো ভাবনা-ই
বাকি নেই জানতে যে কে কেমন।

৭.৮.৫৪

প্রলক্ষণ *

অবিশঙ্ক ভূ-অস্তিত্ব—
ধ্যানস্থ শাদ্বলে যোগী,
বিবক্ষিত বার্তা সাবধানী ;
সায়ন্তন সূক্ত প্রঘোষণা ঃ

অশরীরী প্রতিচ্ছায়া
শিশংপা অরণ্যে ;
মধুঘ্রাণ কিঞ্জল উচ্ছ্রায়ী।
সুবিস্তর গর্ভরেণু,
পুষ্পে তাই পর্যাপ্ত প্রীণন
অন্যোন্যের আলিংগনে
প্রণয় জৃম্ভন,
জুগুপ্সার লেশমাত্রহীন।

প্রবিবর্ত শৃংগার প্রক্রিয়া,
এ যেন বিশ্রদ্ধ যোগ
সান্বয় সংশ্লেষ।
আসলে জিহীর্ষু মন,
মধ্বাসবে মগ্ন অবগাহ।
সিসৃক্ষা প্রবলতম
বিশ্রম্ভ আনন্দে,
যতক্ষণ পরাগ প্রাচুর্য।

সর্বাশী সে আসঞ্জন
তৃষ্যলাভে পূর্ণতৃপ্ত যেই,
শংসাপত্র ব্যর্থ সব।
শূন্যভাণ্ড বিসৃষ্ট ব্যত্যয় ;
উদ্ধাবিত চক্রচর,
ব্যতিষংগ শেষ।
প্রত্যভিজ্ঞা আর নয়—
মৈত্রী ভ্রামরীয়।

উত্তাপ অসংখ্য তাই
ঋষি উপদেশ :
যুগধর্মে মানুষেরা
শিলঙ্কীবৃত্তিক।
দুর্জ্ঞেয় তির্যক পথে
তাস্কর্য তিয়াষী।
তিতীর্ষু যাহারা—
আত্মরক্ষা উরস্ত্রাণে
অতিপৃক্ত স্ব-ধ্যায় সর্বথা,
সাধু সাবধান!

১২.৩.৫৮

* কোনো দুর্বোধ্য কবিতা সংকলনের জন্যে লেখা

পরশুরাম

এভারেস্ট চাই-ই চাই
বলেছেন চৌ,
শীর্ষে বসি হিমাদ্রির
লুঠিবেন মৌ।
চাওয়ায় পাওয়ায় দু'য়ে
অনেক তফাৎ,
তুড়ি মেরে মুখে মুখে
হয় বাজীমাৎ ?
অথচ পরশুরাম
না বলে না কয়ে,
রাজশেখরে কবে
গিয়েছেন লয়ে
হিমালয় রসশৃঙ্গে।
তাঁর সিংহাসন
অচল অটল সেথা,
সে আনন্দ লোকালয়ে
তিনি চিরন্তন।

১০.৫.৬০

বাউল

শান্ত সৌম্য কোন বিবাগী
কোন সে বাউল কি তাঁর নাম,
বীণায় যাহার আগুন জ্বলে
সে ধূমকেতু কি পূর্ণকাম ?

কাব্যে গানে সুরের দোলায়
তুফান বয়ে আনলো যে,
তাঁর কথা এই বাঙলা দেশে
কেমন করে ভুলবে কে ?

আজ ঘুরি যে মুক্ত হাওয়ায়,
তাতেই কি তাঁর একটু দান ?
কবি শুধু কবিই তো নন,
দ্রষ্টা মানুষ পুরুষ প্রাণ।

১৯.৫.৬০

মহাসূর্য

দিকে দিকে প্রতিভাত জনতার মুগ্ধ দীপ্ত
জীবনের জাগ্রত উচ্ছ্বাস ; ঊর্ধ্বাকাশে এক
সূর্য, পৃথিবীতে আর এক চিরায়ু সুভাষ।
অতলান্ত সমুদ্রও তুল্য নয়, প্রেম তার অনন্ত
অসীম। মহত্বে ও মহিমায় সে মহামানব
দেবতাত্মা গিরিরাজ হিমালয় চেয়েও মহান্ ;
জীবনের লাঞ্ছনায় মন যাঁর সতত চঞ্চল,
বাংলার বক্ষধন কাম্য যাঁর বিশ্বের কল্যাণ,
সেই শিব নীলকণ্ঠ বেদনার সমুদ্র মন্থনে--
লোকে লোকে যেই নাম বিপন্নের দুর্বলের
বল। যে গভীর আকুলতা হৃদয়ে হৃদয়ে
জাগিয়েছে দেশে দেশে মুক্তি-তৃষ্ণা স্বাতন্ত্র্যের
শিখা, সে তো তাঁরই দান। আজি তাই অগ্নিগর্ভ
দুই সুপ্ত মহাখণ্ড এশিয়া-আফ্রিকা। সর্ববিধ
বঞ্চনার অবসান লাগি কে ভুলিবে তাঁর সেই
বীর্যঘন উদাত্ত আহ্বান? যার ফলে ছিন্ন ভিন্ন
যত অন্ধকার, আর হেথাহোথা একে একে
মানুষের দাসত্বের বন্ধনের গ্লানিম্লান ফাঁস।
ঊর্ধ্বাকাশে এক সূর্য, পৃথিবীতে আর এক
চিরায়ু সুভাষ। সেই নাম সমুজ্জ্বল সূর্য-স্বপ্নে
অক্ষয়-অক্ষরে ; সে বীরের জন্মদিনে জয়ধ্বনি
তাই ঘরে ঘরে।

ইউরেকা

ইউরেকা ! ইউরেকা !!
কিন্তু সত্যকে পাওয়ার যে পরম আনন্দ
তা যেমনি দুর্লভ তেমনি কঠোর তপস্যা-সাধ্য ।
মহাসমুদ্রের তরঙ্গ-ফণায় শাশ্বত বার্তা ঃ
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, চরৈবেতি !
মহাকালের একই সেই ঘোষণা,
একই ধ্বনির চিরন্তন সেই প্রতিধ্বনি ঃ
এগিয়ে চল, এগিয়ে চল, চরৈবেতি !
পথের শেষ নেই, এক লক্ষ্য থেকে আরেক লক্ষ্যে
তোমার অগ্রগতি। নিত্যনতুন মনিগর্ভ দিগন্তের
আবিষ্কারে তোমার জয়যাত্রার সার্থকতা ।

স্নিগ্ধ মমতা আর মনোরম করুণার
গঙ্গা-যমুনায় আমার দেশের মাটি
প্লাবিত হোক । আর আমার দেশের মানুষ
পৃথিবীর সমস্ত মত্ততাকে উপেক্ষা করে
সত্যকে পাওয়ার প্রত্যয়ে স্থিরবিশ্বাসী
এবং প্রজ্ঞায় উজ্জ্বল হয়ে উঠুক !
স্বাগত সুবুদ্ধি ! আর্কিমিডিসের কাছে
আমাদের ঋণ, সমগ্র মানব সমাজের ঋণ
সত্যই যে অপরিশোধ্য !

খোকন রাজা

দুধে-ভাতে খোকন মানুষ হবে,
মাছে-ভাতে খোকন মানুষ হবে,
খোকন মোদের রাজরাজেশ্বর হবে।

কিন্তু
গোয়ালার সব গাইগুলো কি গত ?
পুকুর-জলায় মাছতো ছিল কত !
আজকে সে সব কোথায় গেল তবে ?

ভাতেও শুনি পড়েছে বিষম টান,
মাঠেও নাকি ফলে না তেমন ধান,
এমনি আকাল আর কতদিন রবে ?

দুধে-ভাতে খোকন মানুষ হবে,
মাছে-ভাতে খোকন মানুষ হবে,
খোকন মোদের রাজরাজেশ্বর হবে,
সে সাধ মোদের সফল হবে কবে ?

জানি
রাজার পাপে রাজ্যে হাহাকার,
চতুর্দিকে কেবল অনাচার,
কিন্তু একের দোষে ভুগবে কেন সবে ?
তাই খোকন মোদের নতুন রাজা হবে।

এই বসন্তে

অবশেষে আদ্যন্ত নিষ্ফল।
পণ্ডশ্রম, অপোগণ্ডে বৃথা উপদেশ ;
সুবিন্যস্ত মনোহারী কথার বিস্তারে
বল্লমের ফলা শুধু শূন্যে গিয়ে বিঁধে।
কলম্বোয় কানাকানি, পিকিং দিল্লীতে
ক্ষণে ক্ষণে যুক্ত আর বিযুক্ত ঘোষণা—
বিসদৃশ উপহাস সমুদ্রের ফেনা।

নেফার নেপথ্যে হাসে প্রেতমূর্তি
ক্রুর শঠতার। লাদাক লাবণ্যময়ী,
সেখানে শ্মশান। চেঙ্গিজের জঙ্গী আত্মা
মূর্ত তার অষ্ট শত বার্ষিকী বৎসরে।
বুদ্ধ বরবাদ। যেখানে নির্মম হাতে
নিষ্পেষিত বোধ, অন্ধকার কাল
পাখা মেলে। শীত শেষে কোন বার্তা
নিয়ে আজ দ্বার প্রান্তে বসন্ত আগত ?

এক ঝাঁক রোদ্দুর

কখন যে কেটে গেছে বিষাদ-কুয়াশা,
কখন রৌদ্রের ঝাঁক নেমেছে আকাশে!
স্বপ্ন ও শ্রমের সৃষ্টি প্রান্তর-ফসল,
পঙ্গপাল আর্বিভাবে সহসা প্রমাদ।
তবুও বিশ্বাস তীব্র, দূর দুর্বিপাক! দুর্বার
সংগ্রামী সত্তা উদ্বোধিত নতুন জগতে।
কী প্রচণ্ড শক্তি তার, দুর্জয় সাহসে অগ্রসর।
জাগ্রত মানস। ইতস্তত: ভুলভ্রান্তি
স্খলন-পতনে বৃথাই ভ্রূক্ষেপ! মেঘের
মুদ্রিত চোখে অশ্রুর সাগর। সে অশ্রুতো
হাসি আর আনন্দে মুখর। গোলাঘরে
প্রাণস্তূপ, কী উজ্জ্বল কনক-অঞ্জলি!
সন্নিবিষ্ট অসংখ্য মানুষ প্রতীক্ষিত
মধ্যাহ্ন মুহূর্তে। ক্রুশবিদ্ধ যীশু-হত্যা
প্রত্যক্ষ করেছি বার বার। তবু আস্থা অব্যাহত
আপন অস্তিত্বে, রোদ্দুরের বৈশাখী
মেলায়। অকস্মাৎ অগ্নিকণা নির্বোধ
পাথরে, জীবনে সে ও তো এক জ্বলন্ত আশ্বাস!

পুরনো এস্রাজ

দক্ষিণ জানালা পথে
আবহাওয়া সংবাদ :
গান শুরু রজনীগন্ধার
মৃতপ্রায় দুপুরের শেষে ;
অবসন্ন আলো, অদূরে
গোধুলি চিন্তা। কিশলয়ে
সূর্য অভিমান। মুহূর্ত গড়িয়ে
নিয়ে ধানের সবুজে শান্ত
মুগ্ধ মন। আত্মাই আত্মীয়
শুধু, সহসা এ জ্ঞান !
জীবন-পিপাসা মূর্ত প্রাচীন
মন্দিরে। এ দেহও মন্দির
দেয়াল। আসন্ন নক্ষত্র-ভিড়।
সেই ভিড়ে নিরঙ্কুশ হারিয়ে
যাবার আগে নিজেকে খানিক
বাজিয়ে নেবার জন্যে তৃষিত
হৃদয়। তাই এ সন্ধ্যায় আমি
একখানি পুরনো এস্রাজ।

কণিষ্কের কাল

পূবের বারান্দা জুড়ে রোদের জটলা ;
দৃষ্টিপথে অগ্রগামী মুহূর্ত মিছিল।
সহসা পশ্চাতে দেখি কণিষ্কের কাল;
পুরুষপুরের নারী সেদিন চঞ্চল।
সাজায় সন্তানে তারা বিজয় সজ্জায়,
রণক্ষেত্রে প্রত্যেকেই পাঠায় স্বামীরে।
দিগ্বিজয় অভিযানে পরাজিত চীনের সম্রাট,
সন্ধির প্রতিভূরূপে বন্দী তার দুইটি কুমার।

ইতোমধ্যে সভ্যতার বিজয় যাত্রায়
ইতিহাস অনেক মুখর। অতিক্রান্ত
বহু বক্রপথ। অনেক উন্মাদ ঝঞ্ঝা
এরই মধ্যে কতবার উঠেছে আকাশে।
কিংকর্তব্য বিমূঢ়তা দুষ্ট অলক্ষণ,
জয়ের সন্ধান আনে
অতন্দ্র প্রহরা আর পর্যাপ্ত প্রস্তুতি।
এইবার মনে হয় পূবের বারান্দা জুড়ে
ছায়া ফেলে দূরাতীত কণিষ্কের কাল।

দ্বিরূপা

১

জ্যৈষ্ঠের অলস ক্লান্ত নির্জন দুপুর,
মেঘ মেঘ জল জল গান কী মধুর !
বৃষ্টির ফোঁটায় ঝরে স্বপ্নের কুসুম,
কে যেন কোমল হাতে এনে দেয় ঘুম

২

মাঘের ভয়ার্ত ক্লিষ্ট দুর্জয় সকাল,
রোদ রোদ গান শুনে ফিরে পাই হাল
বিন্দু বিন্দু সূর্যকণা সেখানে জীবন,
অকস্মাৎ ঘিরে ধরে এক ঝাঁক মন।

জীবন ও কাব্য

কথা কয় স্রোতস্বিনী পাথরের বুকে,
মনে মনে কবি তাই নেয় টুকে টুকে।
একটি বনের পাখি কোথা যায় উড়ে,
দৃষ্টি ছড়ায় কবি তারও চেয়ে দূরে।

২

তপস্যার নেই শেষ, কত যায় জানা ?
অজ্ঞাত অনেক, তাই কবির কল্পনা।
ঝর্ণাধারার হাসি আলো ঝলমল,
জীবনও তেমনি ধারা চির চঞ্চল।

এক কাপ কফি

আকাশে বাউল মেঘ ব্যস্ত অন্বেষণ,
রক্তাক্ত চঞ্চল হাওয়া তৃষ্ণা অনুক্ষণ।
কোথায় বৈকাল হ্রদ সেখানে হৃদয়,
কান পেতে শুনি যত স্বপ্নের বিস্ময়।
আত্মা আর সমুদ্রের অন্তরঙ্গ যোগ,
মহাকাব্য রসাশ্রিত কৌন্তেয় সম্ভোগ।
আকাঙ্ক্ষার উদ্গিরণ জাহাজী ধোঁয়ায়,
আকণ্ঠ ক্ষুধার তৃপ্তি প্রাণময়তায়।

সর্বাঙ্গে অশান্ত জ্বালা গ্রীষ্মের দহন,
ইষ্টার্ণ রেলের কোনো অখ্যাত স্টেশন;
চকিতে কাহারে দেখে দাঁড়াই নিশ্চল,
কে যেন ছিটিয়ে দেয় মুক্তো-ঝরা জল।
কী সুন্দর বাঁদিকের প্রোফাইল মীরার!
জীবনের স্বাদ ঠিক কফির লিকার।

[তন্‌কা জাপানের প্রাচীন কবিতার একটি বিশেষ রূপ। জাপানের প্রাচীনতম কাব্য-সংকলন 'মানিওস্থ'র সাড়ে চারশো কবির প্রায় সাড়ে চার হাজার কবিতার অধিকাংশই এই তন্‌কা জাতীয় মাত্র। একত্রিশটি অক্ষরের মধ্যে এ কবিতা সীমায়িত। সপ্তদশ শতকের শেষার্ধে বিখ্যাত জাপানী কবি মাৎসুবাসো তন্‌কার কিছু সংস্কার সাধন করেন এবং তাঁর সংস্কৃত তন্‌কা হাইকু বা হুক্কো নামে পরিচিত। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'জাপানযাত্রী'তে কবি মাৎসুবাসোর হাইকু কবিতার অনুবাদ করেছেন। এখানে বাংলায় কয়েকটি তন্‌কা ও হাইকু জাতীয় কবিতা রচনার চেষ্টা করা হয়েছে। সফল না হলেও জাপানী কবিদের কাছে আমার এই জন্যে ঋণ স্বীকার করা হচ্ছে।]

একগুচ্ছ তন্‌কা

১

পৃথিবী হাসেঃ
বাতাস কথা কয়,
তাহার সে কথায়
শূন্য আকাশে
প্রণয় বিনিময়।

২

সমুদ্র ডাকেঃ
নদীর আকুলতা,
স্বচ্ছ হাসির স্রোত;
মহৎ দাবী,
মহৎ আত্মদান।

৩

ভারতবর্ষ :
একটি পুণ্য নাম;
নিঃশেষে নিবেদন
লক্ষ প্রণাম,
অন্তরজুড়ে প্রেম।

৪

দু'টি পুতুল—
নারী আর পুরুষ।
একের হাতে সাকে,
অন্যের চোখে তৃষ্ণা।
ধন্য পৃথিবী!

৫

কুসুম হাসে—
তার অভাব নেই।
আমার কতো দাবী!
অথচ যাই পাই,
তাই হারাই!

এক গুচ্ছ হাইকু

১

আমরা ফুল—
মানুষের হৃদয়
ফুলের আত্মা।

২

হৃদয় রক্ত :
কৃষ্ণচূড়ায় হাসি—
শেষ প্রেমার্ঘ্য।

৩

ঘুমে বিভোর—
সে বুঝি এই এলো!
দিবা স্বপ্ন।

৪

রজনীগন্ধা
শুধুই গান গায়,
আমি ঘুমুই।

৫

গ্রীষ্মের ধ্যান :
আদিকবি প্রকৃতি—
বর্ষা বন্দনা!

কল্যাণের কণা

কল্যাণের কণা পরমাণু, ধ্বংসেরও বটেই।
কেনোও-কন্যার দেহ গন্ধের দাক্ষিণ্যে
বিচলিত কবে বহু মন। সেখানে সময় চিহ্নে
রেখাঙ্কিত হিরণ্য আকাশ। পূর্ণকুম্ভ গৈরিক
প্রত্যাশা। কুশলী শিল্পীর হাতে কারুচিত্রে
কাব্যিক বিন্যাস। রোদের পলাশ ঘ্রাণ নেশাখোর
মৌমাছি পাখায়। ময়দানে সন্ধ্যার থাবা
মৃদু মনোরম। ব্যাকুলিত হাহাকার সর্বত্র
ছড়ানো। অম্লান উলঙ্গ আত্মা, বিকলাঙ্গ
সাধ। শীতের বিষাক্ত শ্বাসে হাড়ে মাসে
জ্বালা। কতো পাখি বাসা বোনে মনোমতো
ইচ্ছের মাস্তুলে। আসন্ন রবোট যুগে তুমি-আমি
প্রায় অর্থহীন। দমবন্ধ হয়ে আসে সে
সম্ভাবনায়। হে ঈশ্বর, তোমারইতো কোনো
জন্মোৎসবে আমি এক প্রীতি উপহার;
কিঞ্চিৎ বণ্টন করো শুদ্ধ অক্সিজেন—
বেঁচে থাকি আরো কিছুকাল!

পৃথিবী যখন অন্ধকার

যত ইচ্ছে ছবি আঁকো দেয়ালে আকাশে।
অক্লান্ত তুলির টান, সাত রঙা মন ;
অরণ্য-পাখির চোখে পিপাসা করুণ।
নির্জন কোনোও দ্বীপে নিভৃত সন্ধ্যায়,
এক থালা চাঁদ-ভরা অমৃত-প্লাবন।
সম্মুখে সুদীর্ঘ পথ, পথিপার্শ্বে বুড়ো বট গাছ ;
অনেক স্মৃতির সাক্ষী, প্রতিদিন পত্রের মর্মরে
অনুক্ষণ সেই সব কাহিনী বর্ণনা।
অহংকারে উর্ধ্বগ্রীবা রাজহংসী উদ্যান অপ্সরী ;
দীঘিতে লোহিত পদ্ম সমুজ্জ্বল রৌদ্রের ছোঁয়ায়,
স্বর্গ-মর্ত্যে চলাচল রামধনু সেতু। কোথাও
আগ্নেয়গিরি, অন্যত্র পর্বতমালা তুষার কিরীট।
মরুতে উটেরা চলে ; অক্টোপাস সমুদ্র রাক্ষস।
শূন্যপথে অগ্রগামী সদর্পে বিমান। প্রান্তরে শিশুর
মেলা, উচ্ছল উচ্ছ্বাস। ম্রিয়মান অপরাহ্নে
মোহভঙ্গে উদ্‌ভ্রান্ত নায়িকা। অন্ধকার বিচিত্র জগত,
যত ইচ্ছে ছবি আঁকো দেয়ালে আকাশে।

ভাঁটার কাল

এখন যদিও বাঁধা বহুরূপী দুঃখের বাহুতে,
তবু যেন একই সঙ্গে কথা কয়ে ওঠে, হাসে-নাচে,
গান গায় লক্ষ লক্ষ হত মুহূর্তেরা বিষন্ন বিকেলে।
পলিস্নিগ্ধ মাঠে মাঠে সুখের ফসল, তার স্মৃতিঘ্রাণ ;
জোয়ারের স্বপ্নমোহ দ্রাক্ষার নির্যাস। অনেক রঙীন
গল্প, বঙ্কিম লতার মতো নুয়ে নুয়ে প্রেম নিবেদন ;
অথবা নায়গ্রা কিংবা কেগন প্রপাত নিয়ে যায়
কোথায় ভাসিয়ে। তখন কপোত-প্রাণে মৃদুমন্দ
অনাবিল কবিতা-প্রবাহ। সুললিত সেইসব পুরাতন
দিনের সৌরভে সহসা বিরতি। নতুন সংবাদ নিয়ে
অন্ধকারে অসঙ্কোচ অবিরাম বাষ্পীয় সংলাপ।
চন্দ্রস্থিত সিন্ধুগতি সময়ের পিঠে। অহেতু সংশয় ;
এখন ভাঁটার কাল, অনুভবে উত্তুরে বাতাস।
ক্লান্তিকর গুণ টেনে টেনে অগ্রসর হই কি না-হই ;
তবুও অদৃশ্য এক হাতের ইশারা অকস্মাৎ লক্ষ্যপথে
জাগে—সূর্যাস্তই শেষ নয়, দিন যায় রাত আসে ;
তারপরে সূর্যস্নাত আবার প্রভাত !

যুদ্ধ থেকে ফিরে

আমি যুদ্ধে গিয়েছিলাম ;
বিজয় গৌরব নিয়ে ফিরে এসেছি।
পিঠে আমার কোনো ক্ষতকলঙ্ক নেই,
যা কিছু আঘাত সবই সম্মুখে।

রণাঙ্গনে আমি অনেক শিখেছি।
কী অদ্ভুত প্রশান্তির সঙ্গে মৃত্যুকে ওরা
বন্দনা করে, আলিঙ্গন করে ধন্য হয় !
প্রয়োজন হলে আমিও তেমনি ভাবেই
মৃত্যুকে চুম্বন করে কৃতার্থ হবো।

সীমান্তে এখন নিস্তব্ধতা,
কিন্তু কখন আবার শত্রুর কামান
গর্জে উঠবে কে জানে ? জীবনটাতো আর
শুধুমাত্র কবিতা নয়, সংগ্রামও। এবং আমিও
সতর্ক সেনানী, শান্তি চাই বটে কিন্তু
যুদ্ধের জন্যেও সর্বদা প্রস্তুত।

এখন সাময়িক বিশ্রাম।
নদীর ঘাটে একটু বেড়াতে এসেছিলাম,
ফেরবার পথে ঘাটের শেষ সিঁড়িতে
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সেই নদীরই স্বচ্ছ নীলে
বার বার নিজেরই অবিকৃত ছায়া দেখছিলাম,
আর আপন মনে পরম আনন্দে হাসছিলাম।
ওপারেও তখন অস্তরাগে সূর্য-হাসি।

একটি উপন্যাসের ভূমিকা

অহরহ চৈতন্যের অস্তিত্বে সন্দেহ,
গঙ্গায় ঘোলাটে জলে খণ্ডমেঘ ছায়া ;
কিংবদন্তী কথা নয়, সবটুকু প্রাণ
মনোময়ী মোনালিসা. অশ্রু স্বচ্ছতায়
নিমগ্ন গভীরে চিত্ত, স্বপ্নে জটাজাল।
রাত্রির ললাটে লেখা অনিশ্চিত ছবি,
উন্মুক্ত জানালা জুড়ে গোটা উপন্যাস।
হরিণীর দু'চোখের লাভাস্রোতে দাহ,
সমস্ত লাবন্য-দীপ্তি আলোর আড়াল ;
আত্মায় উন্মত্ত ঝড় অনুভবে স্থির।
বন্দী মন বাতাসের বাহুর বন্ধনে,
প্রমাণ সাপেক্ষ শক্তি রাজসূয় কিংবা
অশ্বমেধে। সাক্ষী সব যাহা কিছু
ইন্দ্রিয়গোচর। মৃত্তিকার উজ্জ্বল পিপাসা!
দুর্দম যোদ্ধার মতো ইলেকৃট্রিক ট্রেন
পল্লীর আলস্য ছিঁড়ে মুহূর্তে উধাও।

পৃথিবী যখন মুখ ঢাকছে

আত্মার মুখোমুখি হয়ে আমি শুধু কাঁদলাম।
একটু আলোর দিকে তাকাতে চেয়েছিলাম,
কিন্তু অন্ধকার আরো বেশি ঘন হয়ে
ঘিরে ধরলো আমাকে।

মনে হলো আমিও যেন অপরাধী ;
শুধু আমি নই, আমরা সবাই।
প্রমাণ হলো আমার ভালোবাসা অক্ষম ;
শুধু আমার নয়, আমাদের সকলের।

ওদের কাউকেই তো আমরা বাঁচাতে পারি নি !
শোকের আর্ত সুর আমার শিরায় শিরায়,
আর একটা বোবা ধ্বনির ঢেউ-এর কেবলি
সারা অন্তর জুড়ে লুটোপুটি।

কয়েকদিন ধরেই পদ্মায় কেমন নিস্তব্ধতা।
তার দুই দিকেই যে আয়ুর ফানুস উড়ছে !
এ মত্ততার কাছে তার প্রমত্ততাও তুচ্ছ,
তাই তার অবাক বিস্ময়।

কালো পর্দায় পৃথিবী যখন মুখ ঢাকছে,
চারদিকে তাকিয়ে আমি দেখছি আর ভাবছি,
ওরা তখনো কি দিব্যি অঙ্ক প্রতিযোগিতার
ফলাফল ঘোষণা করে চলেছে !

আলোর পিপাসায় যারা অস্থির তাদের জন্যে

দরজা-জানালা সব খুলে দাও,
খাঁচায় বন্দী পাখীদের আর্তনাদ
আর আমি শুনতে পারছি না !

চতুর্দিকে ধূসর কুয়াসা ভেদ করে
বাইরের হাওয়ায় ওরা মুক্তি চায়,
আলোর পিপাসায় ওরা অস্থির।
তাই দরজা-জানালা সব খুলে দাও,
খাঁচায় বন্দী পাখীদের আর্তনাদ
আর আমি সইতে পারছি না !

তোমার-আমার মতোই যে ওদের
প্রাণেও নতুন বসন্তের উৎকণ্ঠা জাগে,
অকরুণ উত্তাপে ওদের মমতাও যে
মোমের মতোই গলে ঝরে যায়—
তা' কি আর তোমরা জান না ?
তাই দরজা জানালা সব খুলে দাও,
খাঁচায় বন্দী যন্ত্রণা-কাতর সব পাখিরা
মুক্তির আনন্দে মেতে উঠুক ! ওদের
আর্তনাদ আর আমি সইতে পারছি না !

কোনো এক সমুদ্রের নাম

রাত্রি যেন কোনো এক সমুদ্রের নাম,
সুগভীর অন্ধকারে রহস্য অতল ;
মনগুলি ভাসে সেই সাগরের ইচ্ছের
জোয়ারে দেহের আড়ালে থেকে সংখ্যাহীন
মাছের মতন। তৃষ্ণার স্রোতের ধারা,
কোজাগরী প্রেম ঢেউ ঢেউ। হিরন্ময়
সমস্ত কামনা, তাই নিয়ে মাঝে মাঝে
মাতাল ক্ষণেরা জ্বলে জ্বলে ওঠে অকস্মাৎ।
বাতাসের হামাগুড়ি ঠিক যেন ঈষদুষ্ণ
কিশলয় হাতের প্রলেপ। নিদ্রার নিঃশ্বাস
ঝরে অবসন্ন শিমুলে-পলাশে, স্বপ্নে
কৃষ্ণচূড়া। মৌন কোলাহল কেটে ডিঙি
পারাপার। হৃদপিণ্ড পেণ্ডুলামে মুহূর্তের
নিখুঁত হিসেব। হঠাৎ গলির মুখে বিড়ালের
বিকট চীৎকার, বিমুখ বঞ্চিত কিংবা অন্য
কোনো অজ্ঞাত কারণ। ঘুম ভাঙে সকালের
নিরাসক্ত উজ্জ্বল প্রত্যয়ে, সমুদ্র পেরিয়ে
আসি ঝর্ণাঝরা রোদের প্রান্তরে।

রোদ আমার চাই-ই

সে এক দুঃসহ যুগ,
অসামান্য দুঃখের সেদিনে
সে-এক অধীর অস্থিরতায়
ভয়ঙ্করকে আমি ভালবেসেছিলাম ;
আমি তার আশ্রয় নিয়েছিলাম
শুধু আত্মসুখের তাগিদে নয়,
সকলের কল্যাণ কামনায়।
কিন্তু যেখানেই অপ্রেমের ছায়া,
সেখানেই দেখি অশুভের ভিড়।
চক্রান্ত সে সংক্রামক ব্যাধি ;
সন্দেহের সন্ধ্যা পরিবেশে
অবিশ্বাস মেঘ তার দু'ডানায়
দূরে ঠেলে রাখে দূরে বহু দূরে
সবটুকু রৌদ্রের করুণা।
না, রোদ আমার চাই-ই ;
প্রসার এবং বৃদ্ধির জন্যে রোদ চাই ॥
প্রখর কিরণদীপ্ত আমার উঠোনে
আজ তাই সমগ্রকে নিয়েই সুধাপান।

অলক্ষ্যে বিকেল

অরণ্যের ডালে ডালে
কখন অলক্ষ্যে যেন নেমেছে বিকেল,
কদাচিৎ থেমে থেমে অতি দ্রুত
ছোটে বোম্বে মেল।
আমার কোথায় স্থান
নগরীর প্রশস্ত হৃদয়ে ?
অজানা, তবুও সুখী
সকলের দুঃখে সঙ্গী হয়ে।
জড়ির পুরনো কোট গায়ে ঢিলে ঢালা,
দ্যূতক্রীড়া শেষে হাতে রুদ্রাক্ষের মালা
কেন নেবে, কোন ভরসায় ?
ঐ যে গোলাপ ফোটে কোনো কি আশায় ?
ম্রিয়মান কণ্ঠে কেন রামধুন প্রার্থনা সঙ্গীত ?
নিদাঘ গ্রীষ্মের শেষে তুহিন স্পর্শের থাবা
বাড়াবেই শীত।
হয় হোক জীবনের ছায়া দীর্ঘতর,
আমার তো আছে জানা—
আমার অস্তিত্ব আর প্রত্যয় অমর।
হীরে-মুক্তো খুঁজে খুঁজে কে না হয়রান,
অনিশ্চিত অন্বেষণে নিত্য ক্লিষ্ট প্রাণ।
এ নিশ্চয় জেনে শান্তি—
মানুষ যেখানে আছে সেখানেই মন,
আফ্রিকার আঁধারেও কবিতার নন্দন কানন।

নরক পেরিয়ে

বিন্দু বিন্দু আশার বিন্যাস
অন্তরে প্রবহমান, প্রসন্ন সরব।
শান্তির আশ্বাস কোনো
ঘৃণা আর বিদ্বেষের নরকে সম্ভব?
(তাই) রেণু রেণু অটল বিশ্বাস,
তার সাথে কণা কণা অত্যুজ্জ্বল প্রেম
পৃথিবীর মৃত্তিকায় ছড়িয়ে দিলেম।
মুক্তির সড়ক এক,
প্রেম সেই পথের নিশানা ;
আমার ললাটে লেখা
ঈশ্বরের সঠিক ঠিকানা।

নক্ষত্রের নাম

দুঃখেরই আরেক নাম সুখ বলি তারে—
সেই সুখ আর দুঃখ লয়ে
মানুষের মেলা বসে পৃথিবীর কিনারে কিনারে ;
সে মানুষই মৃত্যুঞ্জয়ী সব দুঃখ জয়ে।

সে এক অমৃতলোক—
অবিরাম সংগ্রামের শেষে
কিঞ্চিৎ বিশ্রাম ;
স্থিরলক্ষ্য অন্ধকারে
জওহর উজ্জ্বলতম
নক্ষত্রের নাম।

খেয়া

ওই পারে উঁচুনীচু আলোর মিছিল,
চিন্তার কলরবে এপার মুখর ;
গাছের মাথায় যত আঁধারের ঘুম,
কানে কানে কথা কয়ে বাতাস পালায়।
সবুজ ঘোমটা টেনে সব সয়ে যাওয়া,
কে আছে সহনশীলা মাটির মতন ?
নক্ষত্রও ক্লান্তিহীন রাত জেগে জেগে।
ময়ূর পেখম মেলে হৃদয়ে হৃদয়ে,
কিন্তু তার কত আয়ু কতটুকু খেলা ?
সুরে সুরে হাসি আর কান্নার ঝড়,
অতৃপ্তি নদীর বুকে ক্ষণে ক্ষণে ঢেউ ;
মোট ফল জীবনের স্বাদ নোনা নোনা,
আশার আনন্দ সে তো সবই অনিশ্চয় ;
খেয়াঘাট পারাপার তবু অহরহ।

স্বগতোক্তি

হে ঈশ্বর,
তোমার ঈর্ষার তাপ চতুর্দিকে যদিও
ছড়ানো, অঙ্গীকার কেন মিথ্যা হবে?
ধোঁয়াসা ক্ষণেক যদি ঢাকে বা রোদ্দুরে,
গলে গলে নিজেই নিঃশেষ। সমুদ্রে
জাহাজ। অনন্ত পিপাসা মূর্ত নগরীর
আত্মায় অন্তরে। আহত মুহূর্তে যত
বারংবার উঁকি দিয়ে ত্রস্ত পলাতক
অরণ্যের হরিণের মতো। স্থবির আলস্য
আর নির্বোধ সংস্কার পথে অন্তরায়।
বিচিত্র রঙের খেলা প্রতিদিন মায়াবিনী
পৃথিবীর সাথে, প্রকৃতি বিষন্ন কভু
কখনো উচ্ছল। নিরুদ্বেগে ভেসে চলা
আকাঙ্ক্ষার স্রোত সমারোহে, নির্ধারিত
শ্রদ্ধেয় বিধান। ভালোবাসা চাই বটে,
তাই বলে ভেবো না ভিখারী।

আশা যখন বৃষ্টি

ঝাউগাছে তখন বিকেল
গড়িয়ে পড়ছিলো। গ্রীষ্মের
রৌদ্রে পোড়া বিকেল।
আকাশে মেঘের ঘনঘটা,
মাটিতে ময়ূর। ময়ূরের
পেখমে প্রত্যাশার অমৃত
নাচ। হ্রদের জলে বিকেলের
কালো ছায়া। পোড়া বিকেলের
ছায়া! সেই কালো জলে মৃদু
বাতাসের ঢেউ। শুধু হ্রদে নয়,
অনেক হৃদয়েও। আশা যখন
বৃষ্টি হয়ে নামে তখন প্লাবন।

ইন্দ্রজাল

পৃথিবী থেকে একটু দূরে বেড়াতে গিয়ে
হঠাৎ থমকে দাঁড়াই। ইস্টিশন থেকে
ইঞ্জিনটা একটা ডাক দিয়েই চলে গেল।
যাক, তাতে ভাবনারই বা কী এমন কারণ
থাকতে পারে? জায়গাটা কিন্তু বেশ!
ধ্যানস্থ একটা পাহাড়ের গা ঘেষে ঘেষে
পথ চলছিলাম। হঠাৎ চোখে পড়লো
সরষের মাঠে সুন্দর হলদে ফুলের মেলা,
তার পাশেই কলাই ক্ষেতে ঘন সবুজের
সমারোহ। একধারে সারি সারি তাল ও
নারকেল গাছ। তারই ওপর দিয়ে দূর থেকে
উড়ে এসে একটা শঙ্খচিল কোথায় উধাও।
দৃষ্টির বাইরে তাকিয়ে তাকে দেখবার
বিফল চেষ্টা। প্রকাণ্ড এক কাকচক্ষু দীঘির
জলে মাছেদের বিরাট উৎসব, ঠিক যেন
পুরনো কোনোও কলেজেরই বাৎসরিক
রি-ইউনিয়ন। আসলে তো ইন্দ্রলোকও
স্বপ্নলোকও বটে!

চিত্র প্রদর্শনীতে

চোখ দিয়ে চেখে চেখে দেখি,
হাত দিয়ে ছুঁতে ভয় পাই ;
মনে গেঁথে নিয়ে যাই লেখি—
এখানে অনেক কথা,
আজো যাহা বলা হয় নাই

রঙে রঙে সুর নেচে চলে,
প্রাণে প্রাণে গান তোলে ঢেউ ;
টানে টানে তুলি যায় বলে
তোমার আমার আর
সকলের সব কথাকেই।

একটি প্রার্থনা

এখনো নিশ্চয়ই থাকে নৌকো সারি সারি
নারানগঞ্জের ঘাটে শীতলক্ষ্যা তীরে।
মধ্য গাঙে লঞ্চ এসে থামে সেই আগেরই মতন,
দীর্ঘ কাঠের ব্রীজে এখনো তেমনি ওপারের
যাত্রীদের ভীড়। জীর্ণ মন্দির সাক্ষী কালের
প্রতীক, দূর থেকে চূড়া লক্ষ্যপথে। হাহাকার
হতাশ্বাস ধমনীর রক্তস্রোতে স্মৃতির জোয়ারে।
মাটির মানুষগুলি আর যত সুনিবিড় সরল
নিঃশ্বাস কলের ধোঁয়ার বিষে বিষাক্ত পঙ্কিল।
নির্বিরোধ বাচালতা স্বতঃই নিঃশেষ, দুয়ার-জানালা
বন্ধ। খবর-কাগজে শুধুই দুঃসংবাদ পাতায় পাতায় ;
মরণ অনেক সোজা অভীপ্সিত জীবনের চেয়ে।
প্রার্থনা রাত্রির কাছে এইবার ভোর হয়ে জাগো
আলোর ডানায় চড়ে কল্লোলিত জনতার সমুদ্রের
বুকে। দেখি যেন হাসির প্লাবন শুধু হাটে-গঞ্জে
বন্দরে-প্রান্তরে, ছোট-বড়ো সকলের হৃদয়ে-অন্তরে।
বিশ্বাসের দীপান্বিতা, স্তূপাকার রোদের পাহারা
স্থায়ী হয়ে থাক সর্বক্ষণ গৃহস্থের দুয়ারে দুয়ারে।

মোমের পুতুল

অবোধ বিশ্বাস নিয়ে গড়ে তোলা
মোমের পুতুল। মোমের পুতুলে গড়া
ছোট বড়ো অসংখ্য সংসার। সকালে
সন্ধ্যায় রাতে শুধু কোলাহল। আপামর
সকলেই নীলকণ্ঠ হলাহল পানে। ফুল
ফোটে রোদের আদরে। মানুষের হাড়
মরু, সে আদর বিশুষ্ক সেখানে। সবাই
অজ্ঞাত যেন পরস্পর শূন্য-পরিচয়।
ক্রোধান্ধ পরশুরাম সর্বক্ষণ উদ্যত কুঠার।
প্রীতিহীন মন আর স্রোতহীন নদী—
উভয়ে পতিত। সর্বত্র কালের রূপে তারই
প্রতিচ্ছবি। অথচ সবারই জানা আমরা
পুতুল ; মোমের পুতুল সব পলে পলে
গলে গলে নির্ধারিত সময়ে নিঃশেষ !

নিঃশব্দ কথার ভীড়ে

মন যেন একা এক বিশাল বিটপী
বহু ডালপালা ।
বাদুড়ের মতো ঝোলে ইচ্ছেরা সেখানে ।
কখনো রঙ্গীন স্বপ্ন লাল-নীল ডানা মেলে
কোথায় উধাও ;
কখনো চলার পথে পায়ে পায়ে ছায়া ।
মাঝে মাঝে অপমৃত্যু অনেক ইচ্ছের ;
হৃদয়ে কান্নার বান তখন উত্তাল ।
নিঃশব্দ কথার ভীড়,
কান পেতে শুনি—যদি কোনো বার্তা আনে
উত্তরের মেঘ,
কিংবা অন্য কেউ কোনো অজ্ঞাত সারথি ;
সে আশায় রাত্রি জাগা উল্লাসে উদ্বেগে ।
তারপর ভোর হলে, কণা কণা রোদে
বাইরে বেরিয়ে দেখি—
এক গাছ পদ্মফুল হাসিতে উদ্বেল ।

একটি পবিত্র মুখ

ঢেউ-এর সিঁড়ি বেয়ে বেয়ে এক ঝলক হাওয়া
পার হয়ে গেল ভাগীরথী। নৌকোর গলুইয়ে
বসে আমি তখন মনে মনে কোন্ একটা গানের
সুর যেন ভেজে চলেছিলাম। উল্টো দিক থেকে
আরেক খানি নৌকো অকস্মাৎ বিদ্যুৎ গতিতে পাশ
কেটে চলে গেল। একটি পবিত্র মুখের আলোয়
চোখ ঝলসে যাবে অমন করে আমি যে তা'
ভাবতেই পারিনি। পাল্টা নৌকোর গলুইতেও
কে একজন—শিশু কোলে কে একজন তরুণী মা!
উদাস ভাবে কী যে ভাবছিলেন তিনি একান্তে,
হয়তো তাঁর সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যতের কথাই
ভাবছিলেন। তাই অমন হঠাৎ আলোর ঝলকানি!
একটি পবিত্র মুখের আলো। সেই আলোতেই নদীর
জলে সেদিন সন্ধ্যায় আমি নিজের ছায়াকে স্পষ্ট দেখেছিলাম

কোনো একদিন টালা পার্কে

সাত ঘোড়ার রথ প্রবল বেগে
ছুটছিল পূব থেকে সুদূর পশ্চিমে।
রোদের রেণু ছিটকে ছড়িয়ে পড়ছিল
চারদিকে। চোখ ধাঁধানো সেই রোদে
টালা পার্কের সব কটা কৃষ্ণচূড়া
গাছেই আগুনের আনন্দ সমারোহ
দেখছিলাম। সবগুলি তাজা মনের
অতল অন্দরেও তেমনি অগ্নিদাহ।
ভাবছিলাম, পৃথিবীর তো বয়েস হলো
—আগুনের উত্তাপ তবু একটুও কিন্তু
কমেনি, কমবেও না। বাসন্তী বাসনার
সেই ঘোষণাই বুঝি কৃষ্ণচূড়ার
ফুলে ফুলে! মিলিয়ে মিলিয়ে দেখছিলাম;
হঠাৎ এক জোড়া পাখি একটা ডাল
থেকে উড়ে যেতেই আমিও টুল থেকে
নিঃশব্দেই উঠে এলাম।

বেহালার এক শাশ্বত সুর

সুমিত্রা একান্তেভাবে শশাঙ্কের কথা :

এখন বম্বেতে আছ, হয়তো বা যাবে বাঙ্গালোরে,
অথবা অমরাবতী অজন্তা বা অন্যত্র কোথাও ;
তারপরে মাসখানি আরো ঘুরে ফিরে
আসবে নিশ্চয় জানি আবার এখানে।
হয়তো বদলেছ বহু এরই মধ্যে আগের সে-তুমি,
নয় অসম্ভব ; হয়তো একান্ত ভাবে হয়েছ নতুন—
তবু চেনা যাবে। কারণ উভয় সত্তা উৎকীর্ণ সেখানে
কালজয়ী আমাদের দৃষ্টির ক্যানভাসে।

অনেক নতুন বন্ধু এতদিনে তালিকায় স্থান পাবে ঠিকই,
পুরনো অনেক নাম তা থেকে যদিও বাদ পড়ে গিয়ে থাকে
এমন কি আমিও যদিবা—তাতে ক্ষতি বিন্দুমাত্র নেই।
স্মৃতিলিপি শিলালেখার মতোই অক্ষয়।
ঘড়িতে যখন সন্ধ্যা প্রতিদিন আজো মনে হয়
মহারাষ্ট্র সৌরাষ্ট্রের সমুদ্র সৈকতে নীলাম্বরী ছায়া
বুঝি নামে। সোমনাথ মন্দিরের চূড়া দেখে দেব-সাক্ষী
বৃথা। নির্ধারিত লগ্ন-তিথি প্রাণশিল্পে নিত্য ভাসমান।
বন্দরে নোঙর বাঁধে কত কত নতুন জাহাজ,
নতুন কদম ফুল রমণীয় প্রতি বর্ষা শেষে ;
সনাতন পরিচয়ে পরস্পর ওরা পরিচিত।

স্টেশন

হৃদযন্ত্র স্তব্ধ হলে সেখানে স্টেশন
হঠাৎ চলতি ট্রেন সেখানেই থামে ;
আবার দুরন্ত বেগে সে-যাত্রা যখন,
এক বুক প্রেমে যেন ভূমিকম্প নামে।

আমরা তেমনি এসে পৌঁছে দিয়ে যাই
কিছু আলো আর কিছু নির্মল বাতাস ;
অন্ধকারে যেতে হবে বহু পথ, তাই
জীবনে উত্তাপ চাই উত্তাল প্রয়াস।

সংগ্রামে বিজয়ী হলে দীপ্ত ভবিষ্যৎ,
কে না জানে সাফল্য যে আনন্দই আনে ;
সেখানে নির্দল সব নেই ভিন্ন মত—
মৃত্যু নয়, মৃত্যু নেই : তারুণ্য মুখর থাক
চৈতন্যের গানে।

বৃষ্টি থেমে গেছে

বৃষ্টি থেমে গেছে, তবু জলগুলি অবসাদে
শুয়ে আছে রাজপথে প্রাঙ্গণে প্রান্তরে।
আবার মৌমাছিদল বহুক্ষণ পরে
শহরের শূন্যতায় ভীড় করে আসে
যেখানে মধুর গন্ধ। অজস্রের চিন্তা আর
ইচ্ছাঘন উষ্ণ নিঃশ্বাসেরা যথারীতি
ভাসমান পূর্বেরই মতন। অন্বেষণ মগ্নতায়
বাঁচার বাসনা অস্তিত্বের আলোকে প্রকাশ।
তুলি ও লেখনী নিয়ে যন্ত্রণারে রূপ দেয়
শিল্পী কথাকার। আমরা প্রত্যেকে স্রষ্টা
পুড়ে পুড়ে সোনা, দিনান্তের রঙ দেখে
নক্ষত্র সভায় মাঝে মাঝে আনন্দে বিভোর।
কিন্তু জানি বহু দেনা জীবনের হিসেব খাতায়,
বর্ষান্তে সুদের অঙ্ক জমে জমে পর্বত প্রমাণ।

এ এক পরম তত্ত্ব

এ এক পরম তত্ত্ব বোঝে না তা' কেউ
সমুদ্রের তীর আমি, তুমি তার ঢেউ ;
আলিংগন প্রত্যাশায় থাকি বুক পাতি,
আঘাতই আসুক শুধু তবু চিরসাথী।

সেরা বিস্ময়

মনের যে পাখা আছে জানা,
যেথা ইচ্ছে সেথা যেতে
নেই কোনো মানা।
চোখও আছে কানও আছে তার ;
যা ইচ্ছে দেখার দেখে,
যা কিছু শোনার।

যখন যা সাধ জাগে খেতে
কোথায় কি অসুবিধে
সেই স্বাদ পেতে ?
মনেরও যে জিভ আছে—আছে অনুভব,
যখন যেমন চাই,
পেয়ে যাই সব।

পৃথিবীর সবচেয়ে সেরা বিস্ময়,
কভু যারে ধরা ছোঁয়া সম্ভব নয়।

যেন দিব্যধাম

হৃদয় হাল্কা হয় কান্না নিবেদনে
সহসা হারায় রঙ আকাশ যখন।
তৃষ্ণার পানীয় নিয়ে বৃথা অহংকার ;
মোরগের ডাক শুনে সূর্যমুখী মন,
দূরভাষে তার কণ্ঠ জাগায় যন্ত্রণা—
বজ্রপাত ঘটে যদি ধ্রুপদী বিশ্বাসে,
সর্বক্ষণ সেই ভয়। তবুও সংকটে স্থির :
ফিরে যদি আসা যায় একবার শুধু
ঈশ্বরের সঙ্গে দেখা করে। তা' হলেই
সমাধান সব সমস্যার। জানাইতো আছে,
প্রধান পাওয়ার হাউস সূর্যের জঠর।
সনির্ভর হওয়া কাম্য তবু প্রত্যেকের, নচেৎ
হতাশা। সৌন্দর্য পসরা নিয়ে ঘোরে প্রজাপতি,
বেগবতী কণ্ঠে গান ইতস্ততঃ ক্ষীণ কলস্বনে।
আপাত-মধুর রাজ্য মনে হয় যেন দিব্যধাম,
চৈতন্যে প্রকট দেখি প্রস্ফুটিত স্বপ্নে এক
মূর্তির তপস্যা। প্রভাতী সংবাদপত্র প্রায়
প্রতিদিনই একই রূপ চিত্র আর কথায় লাঞ্ছিত।

চীন

সহস্র রাত্রির পরে পুনরায় বীভৎস গর্জন,
অভীপ্সিত সুযোগের অপেক্ষার শেষে
নখদন্ত বিকশিত বর্ণচোরা 'কাগুজে বাঘে'র।
রক্তচোষা ঈর্ষার আগুনে দগ্ধ দেহ-মন,
অপ্রেমের দাবানলে পুড়ে ছারখার সুপ্রাচীন
হৃদয় উদ্যান। মৃত্যু মহাসত্য বলে বুঝি
মরণাস্ত্রে অগাধ বিশ্বাস। পরমাণু নির্ভরতা
মৃত্যু ডেকে আনে। নির্বোধ চরমপত্রে
নির্লজ্জ নির্ঘোষ, সাধারণ্যে দর্পিত হুঙ্কার।
পৃথিবীরে উপহাস, পরিণাম চিন্তায় অক্ষম;
সমস্ত মমতাটুকু কেড়ে নিতে সুদীর্ঘ সীমান্তে
ড্রাগনের থাবা সমুদ্যত বিহ্বল আশ্বিনে।
আপন আত্মার হত্যা, সে উৎসবে মত্ত আজ
গর্বোদ্ধত চীন অভিশপ্ত আয়ুবের অঙ্কে
মাথা রেখে।

প্রাণময়ী ভারত

ওরা বেঁচেই আছে ;
হ্যাঁ, ওরা সবাই বেঁচে আছে।
আপন আপন দেহ থেকে অঝোরে
ওরা রক্ত ঝরতে দেখেছে নির্বিকার চিত্তে.
দেখেছে সাথীদের দেহ টুকরো টুকরো
হয়ে চারদিকে ছড়িয়ে পড়তে।
নেফায় বা লাদাকে শত্রু প্রতিরোধে,
অথবা কাশ্মীরের সীমান্তে কিংবা
লাহোর এবং শিয়ালকোটের রণাঙ্গনে
এগিয়ে যেতে যেতে ওদের মধ্যে কেউ কেউ
মাটিতে লুটিয়ে পড়েছে সত্যি, কিন্তু
তবু ওরা কেউ মরে নি—সবাই বেঁচেই আছে।
ওদের শেষ নিঃশ্বাসের উষ্ণ বাণীতে ওরা
প্রত্যেকেই আমাদের বলেছে, শুধুমাত্র
জীবনের কথাই ভাবতে—মৃত্যুর কথা
ভুলেও স্মরণ না রতে। অপরূপ সুন্দর
এই জীবনকে আমরা যাতে পরিপূর্ণভাবে
উপভোগ করতে পারি তার জন্যেই তো ওরা
নিজ নিজ প্রাণের বিনিময়ে আমাদের সামনে
এনে দিয়ে গেছে অজস্র আনন্দ উপহার
আর তার সঙ্গে সঙ্গে অপরিসীম গৌরবময়
সব অধিকার। জীবনের আর আনন্দের
সমবেত সে স্বর্গীয় সঙ্গীতে আমাদের
মৃন্ময়ী ভারত আজ তাই এমনি প্রাণময়ী।

কালের পুতুল

তখন ঘোলাটে আলো, নগরী নীরব ;
পঞ্চদীপে প্রজ্জ্বলন্ত পিপাসার শিখা,
সবশেষে চৌরঙ্গীর চোখে নামে ঘুম ।
ঠেস দিয়ে অন্ধকারে কাটে গোটা রাত ;
বিশ্রুত সংলাপে জ্ঞান, অসংখ্য আহত
চিরন্তন হিংস্রতম আততায়ী হাতে ।
সমস্ত প্রার্থনা গেঁথে স্তবক রচনা,
সমর্পিত উপহার প্রাণ সরোবরে ।
ফলশ্রুতি অনুকম্পা কিঞ্চিৎ মঞ্জুর ;
বুদ্ধির বিনয়ে শান্ত আরণ্য প্রকৃতি ।
ডুবুরি পাখির মতো সামান্যে সন্তোষ ;
অন্যথায় বিপর্যয়, সকলেই কালের পুতুল '
সৃষ্টির প্রত্যুষ থেকে অনন্ত তৃষ্ণায়
অনিবার্য কাতরতা । সেই সত্য অতিক্রম,
উদ্ভট প্রয়াস । চিতাগ্নি সম্মুখে বসি
সঙ্গীতে তন্ময়—অকৃত্রিম প্রশান্তির
দিব্য প্রলক্ষণ !

দক্ষিণারঞ্জন বসু'র

আরও সূর্যের কাছে

একটি স্মরণযোগ্য কবিতা সঙ্কলন

দক্ষিণারঞ্জনের কাব্যে যেমন 'কল্লোল'-পূর্ব যুগের অজ্ঞান অনুবৃত্তি নেই, তেমনি তা আধুনিক কাব্যের পরীক্ষা-নিরীক্ষার সজ্ঞান জটিলতা থেকে মুক্ত। তাঁর কাব্যে অকারণ দুরূহতা, আবিলতা ও বক্রিমার অনুপস্থিতি লক্ষণীয়। স্পষ্ট, তীক্ষ্ণ ও সজীবভাবে তিনি নিজের বক্তব্যকে কাব্যরূপ দিতে সমর্থ।

সবচেয়ে বড় কথা, এই গ্রন্থে বিধৃত কবিতাবলীতে কবি দক্ষিণা-রঞ্জন তাঁর সমসাময়িক দেশকাল সম্পর্কে যে তীক্ষ্ণ সচেতনতার পরিচয় দিয়েছেন, সে সময় সচেতনতা নিঃসন্দেহে বৃহত্তর ইতিহাস বোধের অঙ্গীভূত।